৪

সংবাদ, ১৮ আগস্ট ২০০৪

নতুন দুর্যোগের আলামত

এ জেড এম আবদুল আলী

একটার পর একটা দুর্যোগ যাচ্ছে আমাদের এই হতভাগ্য দেশটির উপর দিয়ে। ডেঙ্গু এল, এল বন্যা। বন্যার পর এসেছে নানা রকমের রোগব্যাধি। সবই প্রকৃতির দেওয়া। কাজেই হা-হুতাশ করা ছাড়া, সহ্য করা ছাড়া আর কিছু করার নেই আমাদের। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বন্যার উপকার আছে। একই কথা বলেছেন ভারতের রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদব মহাশয়। বলে তাঁর দেশের লোকের সমালোচনার মুখে পড়েছেন । যাই হোক, বন্যার উপকারিতা থাকুক বা না থাকুক, কিছুই করার নেই আমাদের। শুধু ভবিষ্যৎ বন্যার জন্য প্রস্তুত থাকা ছাড়া। মোকাবেলা করা ছাড়া। সে প্রস্তুতি, সে মোকাবেলাও এক এক সময় এক এক রকম। আমরা ১৯৯৮ য়ের বন্যার মোকাবেলা দেখেছি। এবারের বন্যারও দেখলাম। বেঁচে থাকলে আরও কত দেখতে হবে কে জানে? কিন্তু সাম্প্রতিক কালের আরেকটি দুর্যোগ দেখার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলাম না বোধহয়। সেই দুর্যোগটি মানুষের তৈরি। এক কথায় এই দুর্যোগটির নাম- পুলিশ। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে পুলিশের নতুন বাহিনী- র‍্যাব। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বন্যায় পাথর আসবে, মাছ আসবে। কিন্তু র‍্যাব কি নিয়ে আসবে তার যা দু একটি নমুনা এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে এই দুর্যোগটি আমাদের যথেষ্ট ভোগাবে। মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে যে নমুনা পাওয়া যাচ্ছে তাতে রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটি মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। সেই যে তিনি বলেছিলেন কুইনিন সম্পর্কে, ম্যালেরিয়া তো কুইনিন সারাবে, কিন্ত কুইনিন সারাবে কে? র‍্যাবের তৎপরতায় হয়তো সন্ত্রাস সারবে(?), কিন্তু র‍্যাব সারবে কি?

সন্ত্রাস দমন ছিল বর্তমান জোট সরকারের নির্বাচনী প্রতিজ্ঞার তালিকায় প্রথম স্থানে। বোধহয় সেই কারণেই, নির্বাচনের অনেক আগে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকার সময়ে বিএনপি'র ডাকা এক হরতালের আগের রাতে দলের নয়াপল্টনের প্রধান দফতরের চারতলায় বোমা বানানোর সময় তা ফেটে গিয়ে একজন নিহত হয়েছিল এবং দফতরের ক্ষতি হয়েছিল। দলের কেন্দ্রীয় দফতরে বোমা বানানোটা কি ধরণের সন্ত্রাস-বিরোধী পদক্ষেপ তা এদেশের জনগণ কোনদিন জানতে চায় নি বা সে সম্পর্কে আজ পর্যন্ত বিএনপি দলের কাছ থেকে কোন ব্যাখা পাওয়া যায়নি। অতঃপর জোট সরকার ক্ষমতায় এসেই আগেকার সরকারের দায়ের করা ষাট/সত্তর হাজার ফৌজদারী মামলার আসামিদের কলমের এক খোঁচায় মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। এটিও সন্ত্রাস দমনের কৌশল কিনা তা বোঝা যায়নি, তবে এতে ফল যা হবার তাই হয়েছিল। সন্ত্রাস বাড়তে বাড়তে এক অসহনীয় অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল। কাজেই, তারপর একের পর এক নতুন দাওয়াই বার করতে হয়েছিল সরকারকে। কোনটাতেই কাজ হয় নি। অবশেষে অনেক জল্পনা কল্পনা করে, ঢাক ঢোল পিটিয়ে গঠন করা হয়েছে এই বাহিনী। সন্ত্রাস দমনে সরকারের অনেক চেষ্টার মধ্যে এটিই হল সাম্প্রতিকতম চেষ্টা। সমারসেট মমের 'লেটেস্ট লাস্ট বুকে'র মতো সম্ভবত এটিই সন্ত্রাস দমনে সরকারের লেটেস্ট এবং লাস্ট প্রচেষ্টা। এর আগে হয়েছে দ্রুত বিচার আদালত, তারও আগে হয়েছিল অপারেশন ক্লিন হার্ট ইত্যাদি। অপারেশন ক্লিন হার্ট শুরু হওয়ার পর সেনাবাহিনীর হেফাজতে একের পর এক হার্ট অ্যাটাকে মারা যাচ্ছিল মানুষ। তবে সেনাবাহিনীকে কোন কৈফিয়ৎ দিতে হয় নি। আজব গণতন্ত্রের 'সব সম্ভবের দেশে' আইন করে জবাবদিহিতা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল তাদের। '*স্লাইটলি* প্রেগন্যান্ট' মেয়ের মতো 'মডারেট ইসলামী গণতন্ত্রে'র দেশে এ সব হতেই পারে বলে সার্টিফিকেট দিয়েছে আমাদের মুরুব্বীরা। কাজেই এরপর আর কার কি বলবার থাকতে পারে?

র‍্যাব গঠন সম্পর্কে কেউ কেউ অবশ্য বোকার মতো প্রশ্ন করেছে, কি দরকার এ সব নতুন নতুন বাহিনী করে? পুলিশেরই তো দায়িত্ব সন্ত্রাস দমন করার। পুলিশ তাহলে আছে কি করতে? পুরনো পুলিশ দিয়ে নতুন সংস্থা গঠন করা পুরনো মদ নতুন বোতলে ঢেলে রাখার মতোই অর্থহীন একটি প্রচেষ্টা। এসব কথা বলেছিল তারা। সরকার এর উত্তরে বলেছে, পুলিশরা এসব পারবে না। সুপার-পুলিশ তৈরী করতে হবে। পুলিশ সামলাবে ছোটখাটো অপরাধ, আর র‍্যাব সামলাবে বড় বড় অপরাধ। একসময় যেমন এ দেশে দু রকমের ডাক্তার ছিল। এলএমএফ আর এমবিবিএস। কেন ছিল জানিনা। বোধহয় এরকম একটা ধারণা থেকে যে, এলএমএফ ডাক্তাররা ছোটখাটো রোগের চিকিৎসা করবে আর এমবিবিএস ডাক্তাররা বড় বড় রোগের চিকিৎসা করবে। সম্ভবত সেই তত্ত্ব মাথায় রেখেই গঠন করা হয়েছে এই সংস্থা– র‍্যাব।

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে পুলিশে র‍্যাবে মিলে এমন একটি দুর্যোগের সৃষ্টি হয়েছে যা থেকে মানুষের নিস্তার পাওয়া কঠিন হবে। গাজীপুরের সুমন নামে ছেলেটি, যে ছিল *আহসানউল্লাহ* মাস্টার হত্যার প্রধান সাক্ষী, তাকে গ্রেফতার করতে গিয়ে যেভাবে হত্যা করা হয়েছিল তখনই মানুষের মনে একটা সন্দেহ এবং আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছিল পুলিশের এই নবগঠিত বাহিনী সম্পর্কে। তারপর আরও ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনা পরম্পরাতেই ঘটেছে শীর্ষ তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নানের গ্রেফতার এবং গ্রেফতার অবস্থায় মৃত্যু। বাহিনী বলছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে একদল সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে যাওয়ার সময়, তাদের কাছে গ্রেফতার অবস্থায় থাকা, পিচ্চি হান্নানকে সাথে করে নিয়ে গিয়েছিল তারা। সেখানে সন্ত্রাসীদের সাথে গুলি বিনিময়ের সময় ক্রসফায়ারে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে পিচ্চি হান্নান। কি আশ্চর্য বক্তব্য। এখানে যে প্রশ্ন গুলি করা যায় তা হচ্ছে, সন্ত্রাসী ধরতে যাওয়ার সময় তারা একজন গ্রেফতারকৃত আসামি, যে নিজেও আহত হয়েছিল কয়েকদিন আগে, তাকে সাথে করে নিয়ে গেল কেন? এটা কি আইনত তারা করতে পারে? আর নিয়ে গিয়ে থাকলে গোলাগুলির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও হাতকড়া পরা অবস্থায় তাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া হল কেন? একজন সন্ত্রাসীও আহত হল না, ধরা পড়ল না, কিন্তু পিচ্চি হান্নানের গায়ে তিনচারটার বেশি গুলি লাগল কিভাবে? বলা হয়েছে বাহিনীর দু জন সদস্যও আহত হয়েছে। তারা কারা? ডাক্তার তাদের দেখেছে কি? তাদের আঘাতের ধরণ কী? হান্নান সম্পর্কে ডাক্তার বলেছে, তাকে *পয়েন্টব্ল্যাঙ্ক* রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়েছে। তাই যদি হয়ে থাকে তখন বাহিনীর অন্য সদস্যরা কোথায় ছিল? আসামী হান্নান যত বড় অপরাধীই হোক, বিচারে দোষী প্রমাণিত হয়ে শাস্তি পাওয়ার আগে পর্যন্ত একজন বিচারাধীন বন্দি হিসেবে তার যে মানবাধিকার প্রাপ্য তা কি সে পেয়েছে? কেউ হয়তো প্রশ্ন করবেন, এরকম একজন সন্ত্রাসীর আবার অধিকার কি? এর জন্য এত কথা বলার প্রয়োজনটা কি? আমাদের মনে রাখতে হবে, এ ধরণের ঘটনার ভিতর দিয়ে পুরো বিচার ব্যবস্থাটাকে নস্যাৎ করা হচ্ছে । এবং সেটা যদি হয়, তাহলে সকলের জন্যেই বিপদ, একদিন সবাই এই অবস্থার শিকার হতে পারে। সেই সম্ভাবনাটাই একটা দুর্যোগের ইঙ্গিত দেয়।

এসব প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যে ভয়াবহ সম্ভাবনার কথা এখন মানুষের মনে জেগেছে তা হলো, হান্নান গ্রেফতারের পর তার মুখ খুলেছিল এবং অন্যান্য সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে খবরাখবর দিচ্ছিল। সবচেয়ে বড় কথা, সে সন্ত্রাসীদের গডফাদারদের নামও বলতে শুরু করেছিল। তবে কি সেই সব গডফাদারদের নাম যাতে প্রকাশ্যে না আসে সে কারণেই হান্নানকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়া হলো? হান্নানের পরিবার এরই মধ্যে সে রকম একটি মন্তব্য করেছে। এসব কথাবার্তা একেবারে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। খবরের কাগজে প্রায়ই পড়ছি যে, অমুক মামলার আসামিকে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়ার আবেদন করা হয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে। এ ধরনের ঘটনার ফলে এরই মধ্যে একটা ধারণা সৃষ্টি করেছে মানুষের মনে যে, বর্তমান সরকার যদিও মুখে বলছেন যে সন্ত্রাসী যেই হোক তাকে ধরা হবে, কিন্তু আসলে অপরাধী গ্রেফতারের ব্যাপারে তাদের নানারকম পছন্দ-অপছন্দ কাজ করে। হাজার দোষী হলেও কিছু লোকের নাম উচ্চারণ করা যাবে না। হান্নানকেও কি এ কারণেও পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হলো যে সে এরকম ভাশুর শ্রেণীর কিছু লোকজনের নাম উচ্চারণ করতে মুখ খুলেছিল। এর আগে এরশাদ শিকদারও নাকি এ ধরনের কিছু লোকজনের নাম বলেছিল। সেই কারণেই এরশাদ শিকদার ধরা পড়ার পর যে রিপোর্টটি তৈরি হয়েছিল সেটি জনসমক্ষে আসেনি। একই খেলা কি এখনও খেলা হচ্ছে?

এসব কারণেই এই ঘটনাগুলিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মানা যাচ্ছে না। পুলিশের ঘটানো আরেকটি ঘটনাতেও এই একই রকমের দুর্যোগের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। সেটি হলো কিছুদিন আগে আওয়ামী লীগের হরতালের আগের রাতে বাসে আগুন লেগে নয়-দশ জন যাত্রীর মৃত্যুর ঘটনা। পুলিশ এ ক্ষেত্রে ছাত্র লীগের কয়েকজন নেতাকে ফাঁসানোর জন্য স্বীকারোক্তি আদায়ের নামে তাদের হাতে গ্রেফতার হয়ে থাকা একজন কয়েদীকে যেভাবে ব্যবহার করেছে সেটি একটি বিপজ্জনক ট্রেন্ড'এর ইঙ্গিত দেয়। এখানে সম্পূর্ণ বিষয়টির ব্যাখ্যা করলে যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে, পুলিশের হাতে বন্দি থাকা অবস্থায় কোনো আসামি যদি বাসে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে তা হলে পুলিশই তাকে সাহায্য করেছে এই আগুন লাগানোর বিষয়ে। তা না হলে সে হাজতে বন্দি অবস্থায় আগুন লাগানোর সরঞ্জাম পাবে কোথায়? আর এখন যদি বলা হয় যে, না- সেই ব্যক্তি আগুন লাগায়নি, তাহলে বুঝতে হবে যে পুলিশ অকারণে নিরীহ মানুষদের জঘন্যতম অপরাধে জড়িয়ে তাদের শাস্তি পাওয়াতে চায়। পুলিশ বাহিনীর এ হেন কার্যকলাপ কি একটি দুর্যোগের পূর্বাভাস নয়? সংঘবদ্ধভাবে দিনাজপুরের ইয়াসমিনকে হত্যা করার জন্য যদি পুলিশের কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড হতে পারে তবে *প্ল্যান* করে বাসে আগুন লাগিয়ে দিয়ে দশ এগারো জন নিরীহ মানুষকে হত্যার দায়ে অথবা সেই হত্যার জন্য কয়েকজন নিরপরাধ ছাত্রলীগ নেতাকে জড়িয়ে তাদের মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করানোর চেষ্টাও তো একই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধ।

পাঠকদের কারো কারো বোধহয় মনে আছে, ষাট এবং সত্তরের দশকে লাতিন আমেরিকার অনেক দেশের পুলিশেরা নিজেদের মধ্যে গোপনে 'ডেথ স্কোয়াড' গঠন করেছিল। প্রথম প্রথম তারা অপরাধীদের ধরে নিয়ে মামলা মোকদ্দমার ঝামেলায় না গিয়ে সোজা গুলি করে মেরে ফেলত। পরে তারা যাকে তারা নিজেদের শত্রু মনে করতো তাকেই টার্গেট করতো, এমনকি তাদের কেউ সমালোচনা করলে তাকেও একইভাবে হত্যা করতে থাকে। অবশ্য, সে সময় লাতিন আমেরিকার সেই দেশগুলির বেশির ভাগই ছিল সামরিক শাসনের আওতায়। আজ আমাদের এই নির্বাচিত সরকারের দেশেও সে রকম কোনো দুর্যোগের পুর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে না তো?

এ জেড এম আবদুল আলী: অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা

৫

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৩ আগস্ট ২০০৪

র‍্যাব হেফাজতে মৃত্যু
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য কী?

নির্মল সেন

আ*হসা*নউল্লা*হ* মাস্টার হত্যাকাণ্ডের প্রধান সাক্ষী সুমন মারা যাওয়ায় র‍্যাব (র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন) নিয়ে লিখেছিলাম। র‍্যাব নিয়ে আবার লিখতে হবে তা ভাবিনি। দেখছি দিন যত যাচ্ছে র‍্যাব ও পুলিশের হাতে মৃত্যুর সংখ্যা তত বাড়ছে। আ*হসা*নউল্লা*হ* মাস্টার হত্যাকাণ্ডের প্রধান সাক্ষী সুমন আহমেদ মজুমদারের মৃত্যুর ২০ দিনের মাথায় র‍্যাব হেফাজতে গুলিতে নিহত হয় আন্ডারওয়ার্ল্ডের শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নান। সুমনের মৃত্যুর রেশ না কাটতেই পিচ্চি হান্নানের মৃত্যু নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। পিচ্চি হান্নানের মৃত্যু বন্দুকযুদ্ধে না পরিকল্পিত? এ নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। বলাবলি হচ্ছে– অপারেশন ক্লিনহার্ট সন্ত্রাস দমনে সাময়িক সাফল্য লাভ করলেও পরবর্তীকালে বেশ কিছু অপ্রীতিকর ও প্রাণহানির মতো ঘটনা ঘটলে সব সাফল্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। র‍্যাবের ক্ষেত্রেও কি তাহলে তেমনটি ঘটবে? সন্ত্রাস দমনের নামে র‍্যাটকে (র‍্যাপিড অ্যাকশন টিম) বিলুপ্ত করে র‍্যাবের আবির্ভাব কি তাহলে শুধুই লোক দেখানো? ইতোমধ্যে এ প্রশ্নটি কিন্তু দেখা দিয়েছে।

২০০৩ সালের ১২ জুলাই জাতীয় সংসদে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন অ্যাক্ট সংশোধন করে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) বিল পাস হয়। সামরিক বাহিনী (সেনা, নৌ, বিমান), বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং কোস্টগার্ড সমন্বয়ে গঠন করা হয় এই বিশেষ বাহিনী। একে অভিহিত করা হয় এ্যালিট ফোর্স হিসেবে। র‍্যাবকে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই (ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন)-এর আদলে গড়ে তোলা হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন র‍্যাব মহাপরিচালক আনোয়ারুল ইকবাল। দেশের ছয়টি বিভাগে ছয়টি এবং অতিরিক্ত একটি ব্যাটালিয়ন থাকবে। বর্তমানে যদিও ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, সিলেট ও খুলনায় র‍্যাব কার্যকর রয়েছে।

র‍্যাব ও পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা দিন দিন ক্রমশই বাড়ছে। নিরীহ মানুষ ছাড়াও শীর্ষ সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীরাও তাদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। ইদানীং কাউকে গ্রেফতার করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর ব্যাপারে এদের দেখা দিয়েছে অনীহা। আর এ কারণেই গত ৬ মাসে র‍্যাব ও পুলিশ হেফাজতে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৭০ জনের (৭ আগস্ট ২০০৪, দৈনিক ভোরের কাগজ)। পুরস্কার ঘোষিত শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নান ও তার দুই সহযোগী দেবাশীষ ও সাহেব আলীকে র‍্যাব ২৬ জুন সাভারের একটি

ক্লিনিক থেকে গ্রেফতার করে। এরপরেই র‌্যাব হেফাজতে থাকা অবস্থায় প্রহারে দেবাশীষ মারা যায়। এর দু'দিন পর হান্নানের আরেক সহযোগী নিটেলের গুলিবিদ্ধ লাশ পাওয়া যায়। পিচ্চি হান্নান গ্রেফতারের এক মাস নয় দিন পর র‌্যাব হেফাজতে রিমান্ডে থাকা অবস্থায় গুলিতে তার মৃত্যু ঘটে। র‌্যাব হেফাজতে সর্বশেষ পিচ্চি হান্নান নিহত হওয়ার আগে গত ১৬ জুলাই টঙ্গীতে যুবলীগ নেতা আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যাকাণ্ডের প্রধান সাক্ষী সুমন আহম্মদ মজুমদার র‌্যাব হেফাজতে মারা যাওয়ায় বিষয়টি নিয়ে সারাদেশে তোলপাড় শুরু হয় এবং এ যাবৎ র‌্যাব হেফাজতে দশজনের মৃত্যু হয় বলে পত্রপত্রিকার খবরে প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ র‌্যাব হেফাজতে মৃত্যুর শিকার পিচ্চি হান্নান। তার এক সপ্তাহ আগে কুষ্টিয়ায় জগতি ৫ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম ওরফে কানকাটা রঞ্জুর মৃত্যু হয়। তারও আগে সুমনের মৃত্যু কাহিনী সকলের মতো আমাকেও আহত, বিস্মিত করেছে। খবরে বলা হয়, 'বৃহস্পতিবার (১৫ জুলাই) বিকাল ৪ টায় উত্তরায় অবস্থিত র‌্যাব-১-এর ২০/২৫ জন সদস্য সুমনকে তার টঙ্গীর আমতলী এলাকার বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে যায়। সেখানে তাকে নির্যাতন করা হয়। ওইদিন রাত ১০টা ৪০ মিনিটে র‌্যাব সদস্যরা আহত অবস্থায় সুমনকে টঙ্গী হাসপাতালে ভর্তি করে। রাত ১টা ২০ মিনিটে সুমন মারা যায়' (১৭ জুলাই ২০০৪, দৈনিক আজকের কাগজ)। সুমনকে খুনের ব্যাপারে যেমন অভিযোগ উঠেছে বিএনপির এক নেতা খুনের সঙ্গে জড়িত, তেমনি র‌্যাব হেফাজতে পিচ্চি হান্নান গুলিতে নিহত হওয়ায় ধারণা করা হচ্ছে জিজ্ঞাসাবাদে কোন গডফাদারের নাম বেরিয়ে আসার কারণেই হান্নানকে সরিয়ে দেয়া হলো। অর্থাৎ র‌্যাব সদস্যরা পরিকল্পিতভাবে হান্নানকে গুলি করে খুন করেছে। র‌্যাব যুক্তি দেখিয়েছে, হান্নান পালিয়ে যাওয়ার সময় র‌্যাব সদস্যরা তাকে গুলি করতে বাধ্য হয়; কিন্তু তাহলে তো গুলি লাগার কথা পিঠে। বুকে কেন গুলি লাগল? এ অভিযোগ কিন্তু করাই যায়। ঐ একই দিনে র‌্যাবের হাতে মারা যায় চট্টগ্রামের এক মাদ্রাসা শিক্ষক শাহনেওয়াজ টিটু। সুমনকে হত্যার তিনদিন আগে খুন করা হয় মোহাম্মদ আলীকে। তাকে মোহাম্মদপুরের রায়েরবাজার বাসা থেকে টানাহেঁচড়া করে ধরে এনে বুকের ওপর বসে নির্যাতন চালানো হয়। তারপর গুলি করে খুন করে লাশ ফেলে দেয়া হয় তার স্ত্রীর সামনে। মোহাম্মদ আলীকে খুন করার ছয় দিন আগে র‌্যাব নির্যাতন করে খুন করেছে দরিদ্র পিতার একমাত্র পুত্র রাইফেল স্কোয়ারের দোকান কর্মচারী শাহজাহান আলীকে। পান্থপথ এলাকা থেকে ধরে নিয়ে র‌্যাব অফিসে অকথ্য নির্যাতন চালানোর পর তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এর তিন দিন পর শাহজাহান আলীর করুণ মৃত্যু ঘটে। (আসক তদন্ত রিপোর্টের সাথে মিল নেই।) সুমনের মৃত্যু সম্পর্কে মানবাধিকার সংগঠন অধিকারের রিপোর্টে বলা হয়, 'তুই তো আহসানউল্লাহ মাস্টার হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী। তোকে তো বিএনপির লোক মারতো। এখন আমরাই মারবো।' কথাগুলো বলেই র‌্যাব সদস্যরা সুমনের দুই চোখ কালো কাপড় দিয়ে বেঁধে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যায়। শুধু হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতনই নয়, র‌্যাবের বিরুদ্ধে সামাজিক নিরাপত্তা ভঙ্গেরও অভিযোগ উঠেছে। র‌্যাব সদস্যরা গত ২০ জুলাই মধ্য রাতে মহাখালীর নিউ ডিওএইচএসে এক অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তার বাসায় দরজা ভেঙে ঢুকে অপরাধী গ্রেফতারের জন্য তল-াশি চালিয়েছে। 'যৌনকর্মী আটকের উদ্দেশ্যে চালানো এই অভিযানে র‌্যাব সদস্যরা টার্গেট বাড়ির বদলে প্রথমে ঢুকে পড়ে অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিরাজুল ইসলামের বাসায়। ওই বাড়ির বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাত ১২টায় একদল লোক তাদের সীমানা প্রাচীর টপকে, দোতলার বারান্দায় দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সব তছনছ করে ফেলে। তারা শোবার ঘরের দরজায় লাথি মেরে আতঙ্ক সৃষ্টি করে ও গুলি করে হত্যার হুমকি দেয়। তিনতলার বাসিন্দা এক পাকিস্তানী নাগরিককে পিছমোড়া করে বেঁধে তার শরীরে অস্ত্র চেপে ধরে। বাড়ির বাসিন্দাদের ডাকাত ডাকাত চিৎকারে র‌্যাব সদস্যরা মিসটেক মিসটেক বলে চলে যায়' (২৭ জুলাই ২০০৪, যায় যায় দিন)। ২৪ জুলাই দৈনিক জনকণ্ঠের একটি খবরে বলা হয়, র‌্যাব এখন পুলিশের অবৈধ বাণিজ্যের উৎসস্থল, যৌন ও মাদক ব্যবসার স্পটগুলোতে বিশেষ উদ্দেশ্যে অভিযান চালাচ্ছে। এর ফলে এসব পকেট পুলিশের বদলে চলে যাচ্ছে র‌্যাবের নিয়ন্ত্রণে।

এসব ঘটনার জন্য র‌্যাব যথেষ্ট সমালোচিত হচ্ছে এবং প্রশ্ন উঠেছে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে এ ধরনের কর্মকাণ্ড কি সমর্থনযোগ্য? এক অপরাধ বন্ধ করতে গিয়ে আরেক অপরাধ কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এই ঘটনার পর প্রশ্ন উঠেছে, 'র‌্যাবকে খুনের লাইসেন্স দিয়েছে কে? সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য গঠিত র‌্যাব কার্যক্রম গঠিত র‌্যাব নিজেরাই এখন সন্ত্রাসে জড়িয়ে পড়ছে। র‌্যাবের হাতে খুন হচ্ছে সাধারণ মানুষ। আনুষ্ঠানিক টর্চার সেলে পরিণত হয়েছে র‌্যাব অফিস। সেনা ও পুলিশ কর্মকর্তা নিয়ে যৌথভাবে গঠিত র‌্যাব কার্যক্রমে কার্যত বেসামরিক কর্তৃত্ব কোণঠাসা হয়ে আছে। র‌্যাব হেফাজতে মাত্র ২০ দিনের ব্যবধানে ৫ জন খুন হয়েছে। প্রতিদিনই নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে ধরে আনা হচ্ছে র‌্যাব অফিসে। তাদের পিছমোড়া করে বেঁধে বুকের ওপর চড়ে , বুট দিয়ে পিষ্ট করে, হকিস্টিকের প্রহারে নির্মম নির্যাতন চালানোর মতো অভিযোগ উঠেছে' (১৭ জুলাই, ২০০৪ জনকণ্ঠ)। এর আগেও 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' নামে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে যৌথ অভিযানের সময় বহু নিরীহ লোক নির্যাতনের শিকার হয়েছে। যৌথ বাহিনীর হেফাজতে ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। তারপর 'যৌথ অভিযান দায়মুক্তি অধ্যাদেশ ২০০৩' জারির মাধ্যমে ওই অভিযানের কারণে সংগঠিত প্রাণহানি, জানমালের ক্ষয়ক্ষতি এবং মানুষের কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হয়ে থাকলে তা থেকে দায়ী ব্যক্তিদের অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। স্বভাবতই আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, র‌্যাব হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাগুলোর ভাগ্যেও একই পরিণতি ঘটবে না তো? যদিও র‌্যাব মহাপরিচালক বলেছেন, এসব ঘটনার তদন্ত করা হবে। তারপরও কিন্তু সে আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

দেশে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হলে সরকারের মধ্যে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তা হলো কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রচলিত পুলিশ বাহিনীকে ব্যবহার না করে অতিরিক্ত ক্ষমতাসম্পন্ন একটি বাহিনী গঠন। র‌্যাব যার বর্তমান উদাহরণ; কিন্তু এ ধরনের বাহিনী ব্যবহারের পরও সন্ত্রাস দমনে স্থায়ী কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। উপরন্তু তাদের হেফাজতে মৃত্যু ও নির্যাতনের অভিযোগগুলো তাদের কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। র‌্যাব, পুলিশ বা এ ধরনের যেকোন বাহিনীর হেফাজতে মৃত্যু আমাদের সংবিধান ও মানবাধিকারের মৌলিক অধিকার এমনকি আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সব নাগরিক আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। ৩১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যেকোনও স্থানে অবস্থানরত

ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার.... আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।' র‌্যাব কি তাহলে সেই অধিকার রক্ষা করছে?

আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাজ হলো কার্যত অপরাধীকে গ্রেফতার করা। তাকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আদালতে হাজির করা। তবে অবশ্যই তা গ্রেফতারের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে করতে হবে। দাগি আসামি হলেও পুলিশ অথবা র‌্যাব হেফাজতে তাকে রক্ষা করাই কর্তব্য; কিন্তু গ্রেফতার থেকে আদালতে নেয়ার মধ্যে কারও মৃত্যু হলে সে দায়িত্ব কার? নিশ্চয়ই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর। সুতরাং সন্ত্রাস দমনে র‌্যাব বা এ ধরনের কোন বাহিনীকে যদি ব্যবহার করতে হয়, তবে তার কার্যক্রম প্রচলিত আইন ও বিচার ব্যবস্থার আওতায় পরিচালিত হওয়া উচিত। আর সন্ত্রাস দমনে পুলিশ বাহিনী যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তবে পুলিশের বিভিন্ন ধরনের সংস্থা যেমন থানা পুলিশ, এসবি, সিআইডি, ডিবি এগুলোকে কেন শক্তিশালী করা হচ্ছে না? সন্ত্রাস দমনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন সন্ত্রাসীদের প্রতি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করা; কিন্তু আমাদের বড় রাজনৈতিক দলগুলো কি তা পারবে? আমার কিন্তু তেমনটা মনে হয় না।

২০০৩-২০০৪ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে ২১৮৭ কোটি ৫৯ লাখ টাকা। ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে বাজেটে এজন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ২৩৬৬ কোটি ৯৭ লাখ টাকা, যা গত অর্থবছরের চেয়ে ১৭৯ কোটি ৩৮ লাখ টাকা বেশি। ধারণা করা হচ্ছে, এ অতিরিক্ত টাকা র‌্যাবের জন্য খরচ হবে। এ বাহিনীর জন্য এত টাকা খরচ করে যদি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি না হয় তবে এত টাকা খরচ করার কোন মানে আছে কি?

আমার সর্বশেষ কথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। র‌্যাব যেহেতু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে নিয়োজিত একটি বাহিনী তাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলছি, অপারেশন ক্লিনহার্টের নামে প্রায় অর্ধশত মানুষের প্রাণহানি ঘটিয়েছেন। সে পর্ব শেষ হলে এখন মাঠে নামিয়েছেন র‌্যাব! ইতোমধ্যে র‌্যাবের হাতে দশজনের প্রাণহানি ঘটেছে। এ নিয়ে কথা উঠেছে। তাই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সন্ত্রাসী ধরার নামে আর কত খুনের লাইসেন্স দেবেন র‌্যাবকে? এই কলঙ্কের কালিমা ঘোচাবেন কী করে? নিরপরাধ মানুষগুলোকে নিয়ে এ খেলা না খেললে কি নয়?

নির্মল সেন: রাজনীতিবিদ

৬

ভোরের কাগজ, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৪

পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু সম্পর্কে কতিপয় প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন

রাশেদ খান মেনন

মানুষ যেমন সন্ত্রাস নির্মূল দেখতে চায়, তেমনি তাদের অধিকার সুরক্ষিত হোক সেটাও চায়। এ কারণেই যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে পুলিশি হেফাজত অথবা কথিত এসব এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনা বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে বটেই, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনসহ সামাজিক সংগঠনগুলোকেও এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য এগিয়ে আসতে হবে।

খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী, সাংবাদিক শামছুর রহমান কেবলের হত্যা মামলায় অভিযুক্ত আসামি লিটু পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মুখেই নিহত হয়েছে। গ্রেফতারের পরপরই তার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল সেটাই সত্যে পরিণত হয়েছে। পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী সন্ত্রাসী লিটুর দেয়া তথ্য অনুযায়ী তাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করতে গেলে তার সঙ্গীরা তাকে ছিনিয়ে নিতে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এ সময় লিটু পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে ক্রসফায়ারে মৃত্যুবরণ করে। পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে সন্ত্রাসীদের মৃত্যুর ঘটনা নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় তথাকথিত পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র ক্যাডারদের সঙ্গে পুলিশের এ ধরনের এনকাউন্টারে মৃত্যুর খবর মাঝে মাঝেই প্রকাশিত হচ্ছে। এসব এনকাউন্টারের সত্যাসত্য বিশেষ কেউ জানে না। এ ব্যাপারে পুলিশের ভাষ্যই মেনে নিতে হয়; কিন্তু পুলিশ হেফাজতে সন্ত্রাসীদের যেসব মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে। প্রথমত, এ ধরনের জীবননাশের ঘটনা, সেই ব্যক্তি যতোই সন্ত্রাসী হোক দেশের সংবিধানের লংঘন। সংবিধানের ৩২ বিধিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে যে, 'আইনানুযায়ী ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না।' সংবিধান অন্যান্য বিধিতে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আইনের আশ্রয় লাভ ও বিচার পাওয়ার অধিকারকেও নিশ্চিত করেছে। দ্বিতীয়ত, এর মধ্য দিয়ে কোনো কিছু লুকোনোর চেষ্টা করা হচ্ছে কিনা সেটাও জনমনের প্রশ্ন। অবশ্য এটা অনেকেই বলতে পারেন যে, এ ধরনের সন্ত্রাসীদের এভাবেই দমন করা সম্ভব। এদের বাঁচিয়ে রাখলে তারা আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে আবার সন্ত্রাসী তৎপরতায় লিপ্ত হয়। সুতরাং এ ধরনের ব্যক্তিদের এভাবে বিনাশ করে দেয়াই শ্রেয়; কিন্তু এর মধ্য দিয়ে যে কাউকে খুনের লাইসেন্স দেয়া হয় সেটা আমরা খেয়াল করি না।

এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল এই জোট সরকারের আমলেই 'অপারেশন ক্লিনহার্ট'- এর সময়। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর হাতে ঐ অপারেশনে নিহত হয়েছিল ৪৮ জন নাগরিক এবং আহত ও পঙ্গু

হয়েছিল প্রায় হাজারখানেক। এসব ব্যক্তির কোনো অপরাধ প্রমাণিত হয়নি। যৌথ বাহিনীর সে সময় অজুহাত ছিল 'হার্ট ফেইলিয়ার'। ধৃত ব্যক্তিরা যে হার্টফেল করে মারা গেছেন বলে প্রচার করা হয়েছিল; কিন্তু তাদের এই যুক্তি যে কোনো প্রকার বিচারের কাঠগড়ায় টিকতো না সেটা বুঝে জোট সরকার অপারেশন ক্লিনহার্টে নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্তদের বিচারের অধিকার রদ করে জারি করেছিল 'দায়মুক্তি অধ্যাদেশ', যা পরে সংসদ আইনে রূপ দিয়েছে। এভাবে দেশের নাগরিকদের বেঁচে থাকার ও আইনের আশ্রয় পাওয়ার মৌলিক অধিকার হরণ করা হয়েছিল; কিন্তু পুলিশ হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই মৌলিক অধিকারকেই লঙ্ঘন করা হচ্ছে এখনো।

এই সংবিধান ও আইনের কথা না তুলেও যে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় তা হলো সন্ত্রাসীদের এভাবে ধরে মেরে ফেলার ঘটনায় সন্ত্রাস কমেছে কিনা। অপারেশন ক্লিনহার্ট যে দেশের সন্ত্রাস দমাতে ব্যর্থ হয়েছিল, ঐ অপারেশন পরবর্তী সন্ত্রাসের ঘটনাবলির অব্যাহত বৃদ্ধি তার প্রমাণ। পুলিশি হেফাজতে সন্ত্রাসীদের মৃত্যুর ঘটনা সন্ত্রাস দমনে ভূমিকা রাখতে পারবে না বলেই সবার ধারণা। বরং এসব সন্ত্রাসীকে বিচারের সামনে দাঁড় করানো হলে তাদের সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী তৎপরতার পেছনের ঘটনাবলি উদঘাটন করা যেতো।

আর এখানেই দ্বিতীয় প্রশ্নটি এসে যায়। আর সেই প্রশ্ন হলো যে, এর মধ্য দিয়ে যে সত্য উদঘাটিত হতো তাকে আড়াল করার জন্যই পুলিশের হাতে ধৃত সন্ত্রাসীদের এভাবে মেরে ফেলা হচ্ছে কিনা। পুলিশি হেফাজতে এ ধরনের সর্বশেষ শিকার সন্ত্রাসী লিটু নাকি তার সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেছিল। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বেরিয়ে আসছিল। আর সে কারণেই সম্ভবত তাকে জীবন দিতে হয়েছে।

একই ঘটনা সত্য পিচ্চি হান্নান সম্পর্কেও। পিচ্চি হান্নানের গ্রেফতারের পর পুলিশ তাকে কয়েক দফা রিমান্ডে নিয়ে প্রচুর তথ্য আদায় করেছিল। এসব তথ্যের মধ্যে পিচ্চি হান্নানের রাজনৈতিক গডফাদারদের নাম ছিল। পিচ্চি হান্নানের বোন দাবি করেছে যে, একজন সংসদ সদস্যের নির্দেশেই নাকি পিচ্চি হান্নানকে 'এনকাউন্টারে' মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। কালা ফারুকের ঘটনাও একই বলে ওয়াকিবহাল মহলের বক্তব্য। অর্থাৎ এসব সন্ত্রাসী যাদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা চালাতো তাদের নাম-পরিচয় যাতে প্রকাশ না পায় তার জন্যই সংবিধান ও আইন লঙ্ঘন করে পুলিশের হাতে ধৃত সন্ত্রাসীদের এভাবে হত্যা করা হচ্ছে। আর এই অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে সেটা কেবল দুর্ভাগ্যজনক নয়, ভয়ঙ্কর বটে। আর সন্ত্রাসের ঐ গডফাদাররা আরও কোন সন্ত্রাসীকে বেছে নেবে তাদের প্রয়োজন মেটাতে। আর এভাবেই সন্ত্রাস অব্যাহত থাকবে।

বস্তুত বাংলাদেশ জুড়ে বর্তমানে যে অপরাধীচক্র গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে রাজনীতি ও সন্ত্রাসের এসব গডফাদারের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এসব গডফাদার তাদের অবস্থানের সুযোগ নিয়ে এসব সন্ত্রাসী লালন করে। এদেরই কারণে পুলিশের পক্ষে এসব সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা অথবা তাদের অপরাধের নেটওয়ার্ক খুঁজে বের করা সম্ভব হয় না। বরং পুলিশও নিজেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে সব জেনেও না জানার ভান করে। মাঝখান দিয়ে সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তার সমস্যা সৃষ্টি হয়। সুতরাং, সন্ত্রাস যদি দূর করতেই হয় তাহলে সন্ত্রাসীদের পেছনের এই গডফাদারদেরও চিহ্নিত করতে হবে। তাদেরও প্রকাশ্যে আনতে হবে। না হলে একজন-দু'জন সন্ত্রাসীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটলেও তাদের সংখ্যা বেড়েই চলবে।

সে কারণেই দেশের মানুষ পুলিশ হেফাজতে সন্ত্রাসীদের মৃত্যু দেখতে চায় না। বরং তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দেখতে চায়। সেই বিচার প্রক্রিয়ায় সন্ত্রাসীদের অপরাধকর্ম যাতে সঠিকভাবে চিহ্নিত হয় সেটাই বিশেষ প্রয়োজন। পুলিশ তা না করে যদি সন্ত্রাস নির্মূলের এ ধরনের পথ বেছে নেয় তাহলে সেটা ভয়ানক কথা। কারণ এভাবে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে একজন সাধারণ নাগরিকও পুলিশের এ ধরনের আচরণ থেকে রেহাই পাবে না। বরং পেছনে খুঁটির জোর না থাকার কারণে তাদেরই এ ধরনের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। মানুষ যেমন সন্ত্রাস নির্মূল দেখতে চায়, তেমনি তাদের অধিকার সুরক্ষিত হোক সেটাও চায়। এ কারণেই যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে পুলিশি হেফাজত অথবা কথিত এসব এনকাউন্টারে মৃত্যুর ঘটনা বন্ধ করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোকে এ ব্যাপারে সোচ্চার হতে হবে বটেই, বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনসহ সামাজিক সংগঠনগুলোকেও এ ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সেজন্য এগিয়ে আসতে হবে।

রাশেদ খান মেনন: সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, সাবেক সংসদ সদস্য

৭

যুগান্তর, ১৯ অক্টোবর ২০০৪

সন্ত্রাস দমনে র‍্যাব

নাকের বদলে নরুণ

রাশেদ খান মেনন

রমজান ও পূজা উপলক্ষে নিরাপত্তার জন্য র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন তথা র‍্যাবের ২ হাজার সদস্য সারাদেশের ৬৪টি জেলায় সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে নেমেছে। সন্ত্রাস দমন, চাঁদাবাজি ও ছিনতাই রোধে তারা কাজ করবে। র‍্যাবের এই সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে মানুষের আশ্বস্ত হওয়ার কথা। এ ধরনের পার্বণকে সামনে রেখেই সন্ত্রাসীরা সাধারণত বেপরোয়া হয়ে ওঠে। মানুষের উৎসবের আনন্দ দূর হয়ে যায়; কিন্তু এই র‍্যাবের কার্যক্রম নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্ন তুলেছে দেশের মানবাধিকার সংগঠনগুলো। রাজনৈতিক মহল থেকেও প্রশ্ন উঠেছে। প্রশ্নটা সন্ত্রাস দমন বা সে ব্যাপারে র‍্যাবের কার্যকারিতা নিয়ে নয়। সন্ত্রাস দমনের প্রশ্নে জোট সরকারের আন্তরিকতা নিয়েই বরং প্রশ্ন আছে। সন্ত্রাস দমনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে জোট সরকার। এক্ষেত্রে গত তিন বছরে বিশেষ কোনো সাফল্য দেখাতে পারেনি। অতীতে যেখানে সন্ত্রাস এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা নির্দিষ্ট এলাকা ও সন্ত্রাসী গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেখানে

জোট শাসনে সেটা বিস্তৃত হয়েছে গণপর্যায় এবং তৃণমূল স্তর পর্যন্ত। এই সন্ত্রাস দমনের জন্য জোট সরকার একসময় সেনাবাহিনীকে পর্যন্ত নিয়োগ করেছিল। সেনাবাহিনীর নেতৃত্বাধীন 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' সাধারণ সন্ত্রাসী তৎপরতা সাময়িকভাবে বন্ধ করতে সক্ষম হলেও সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের মূলে তারা হাত দিতে পারেনি। বরং সন্ত্রাস দমনে তাদের অনিয়ন্ত্রিত কর্মকাণ্ড বিচারবহির্ভূতভাবে আটচল্লিশ জন সাধারণ মানুষের জীবনহানির কারণ হয়েছে। অপারেশন ক্লিনহার্টে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতনের কবলে পড়েছেন কয়েক হাজার মানুষ। অবস্থাটা এমন দাঁড়ায় যে, সরকারকে শেষ পর্যন্ত 'অপারেশন ক্লিনহার্ট' স্থগিত করতে হয় এবং ওই অপারেশনে নিহত, আহত ও ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে আইনের আশ্রয় নিতে না পারে তার জন্য আরেকটি কালো আইন 'দায়মুক্তি আইন-২০০১' পাস করতে হয়।

অপারেশন ক্লিনহার্টের এই অভিজ্ঞতা থেকেই আইনের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সন্ত্রাস দমনের বিশেষ কোনো ব্যবস্থা করা যায় কিনা তার উপায় খুঁজছিল জোট সরকার। সে কারণে পুলিশ বাহিনীকে কেন্দ্র করে প্রথমে 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ট্রুপ বা র‍্যাট' গঠন করার প্রয়াস নেয় তারা। পরে ওই প্রয়াসই 'র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন' বা র‍্যাব গঠনে রূপ নিয়েছে। এর জন্য কোনো নতুন আইন তারা প্রণয়ন করেনি। আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ন আইনের আওতায় সেখানে কিছু সংশোধন করে সন্ত্রাস দমনের জন্য পুলিশের এই বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়েছে। এ বাহিনীতে পুলিশ ছাড়াও সামরিক বাহিনীসহ বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনী থেকে লোক বাছাই করে নিয়োগ করা হয়েছে। একটা 'এলিট বাহিনী' হিসেবে এই র‍্যাবকে গড়ে তোলা হয়েছে। র‍্যাবের জন্য বিশেষ সরঞ্জামাদি, বিশেষ ট্রেনিংয়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেদিক দিয়ে অপারেশন ক্লিনহার্টের যৌথ বাহিনীর যে আইনগত বা প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ছিল না, র‍্যাবের ক্ষেত্রে তা রয়েছে। র‍্যাবের ক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলা হলে তাই সরকারি কর্তৃপক্ষ বলছে, তারা প্রচলিত আইন অনুসারেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ওই আইনের কোনো বরখেলাপ করলে তার ভিত্তিতেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি? র‍্যাব গঠন করার পর সন্ত্রাস দমনের ক্ষেত্রে তারা যে সাফল্য দেখাচ্ছেন বলে খোদ প্রধানমন্ত্রী তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন সে ক্ষেত্রে সংবিধান, ফৌজদারি কার্যবিধি বা পুলিশ আইনের কোনো বিষয় তারা মানছে কিনা। দেশের সাতটি মানবাধিকার সংস্থার পক্ষ থেকে গত ক'দিন আগে সাংবাদিক সম্মেলন করে 'র‍্যাব'-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, 'র‍্যাব' ওই সবকিছুই মানছে না। বরং তারা সন্ত্রাস দমনের নামে বিচারবহির্ভূত সব হত্যাকান্ড ঘটাচ্ছে। তারা তাদের এই বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ডের নাম দিয়েছে 'ক্রসফায়ার'। র‍্যাবের এই 'ক্রসফায়ার' কৌশল অনুসারে সন্ত্রাসী নামে কথিত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে তাকে অস্ত্র উদ্ধার বা সঙ্গীদের খোঁজার নাম করে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে। র‍্যাবের তরফ থেকে বলা হচ্ছে, ওইসব সন্ত্রাসীর সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে র‍্যাব সদস্যদের সংঘর্ষ ও গুলিবিনিময়কালে তারা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব সংঘর্ষ বা একাউন্টারের অকুস্থলের কেউ সে ধরনের গোলাগুলি শুনেছে বা প্রত্যক্ষ করেছে বলে জানা যায়নি। এটা তাই সবার কাছে স্পষ্ট যে, র‍্যাবের হাতে ধৃত ব্যক্তিদের তথাকথিত এই 'ক্রসফায়ার'-এ মৃত্যু পূর্বপরিকল্পিত। সাধারণ ভাষায় বলা যেতে পারে 'ঠান্ডা মাথায় খুন'।

মানবাধিকার সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে যে প্রশ্ন তুলেছে তা তো বটেই, সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকেও এ প্রশ্ন উঠেছে যে, তথাকথিত 'ক্রসফায়ার'-এর এই কৌশল সংবিধান ও আইন অনুমোদন করে কিনা। দেশের সংবিধানে একথা স্পষ্ট করেই উল্লেখ আছে যে, 'আইন ব্যতীত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হইতে কোনো ব্যক্তিকে বঞ্চিত করা যাইবে না'। (বিধি ৩২, বাংলাদেশ সংবিধান)। ওই সংবিধানে এর আগের বিধিতেই বলা আছে, (বিধি ৩১)। 'আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইনানুযায়ী ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইন ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।

সংবিধানে গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কেও রক্ষাকবচ দেয়া আছে। সে অনুসারে 'গ্রেফতারকৃত কোনো ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক' রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। [বিধি ৩৩(১) বাংলাদেশ সংবিধান] এবং 'গ্রেফতারকৃত ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে (গ্রেফতারের স্থান হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আনয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সময় ব্যতিরেকে) হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে অতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না [বিধি ৩৩(২), বাংলাদেশ সংবিধান]। সংবিধানের এই ধারাগুলোই সাধারণ মানুষের প্রশ্নের উত্তর দেয় যে, র‍্যাবের এই 'ক্রসফায়ার' কৌশল সংবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং খুব স্বাভাবিকভাবে ওই সংবিধান অনুসারে প্রণীত সব আইন বিশেষ করে ফৌজদারি কার্যবিধির পরিপন্থী।

তারপরও যখন সরকারি কর্তৃপক্ষ র‍্যাবের এই কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন অথবা স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে বলেন, 'এ নিয়ে বিতর্ক করা ঠিক হবে না' (প্রথম আলো, ১৪ অক্টোবর ২০০৪), তখন খোদ সরকারের উদ্দেশ্য সম্পর্কেই প্রশ্ন এসে যায়। কারণ অপরাধ দমনের জন্য এ ধরনের বিশেষ বাহিনীর অভিজ্ঞতা এ দেশের মানুষের আছে। আইনের অধীনেই সেই বিশেষ বাহিনী গঠিত হয়েছিল এবং তাদের বিচারবহির্ভূত হত্যা এ দেশের রাজনীতির কালো অধ্যায় বলে চিহ্নিত হয়ে আছে এবং আজকের আইনমন্ত্রীর মতো সেদিনের আইনমন্ত্রী খোদ জাতীয় সংসদে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এ ধরনের বিশেষ বাহিনীর অভিযান কেবল অপরাধীদের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু সেটা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কতদূর প্রসারিত হয়েছিল সেটা সবার জানা।

এবারও র‍্যাবের এই 'ক্রসফায়ার' কৌশল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে। তবে সেটা এখনও প্রবল নয়। বরং যে অভিযোগটি বিশেষভাবে উঠেছে তা হলো, যেসব সন্ত্রাসী গ্রেফতার হচ্ছে তাদের গডফাদারদের রক্ষা করতেই এদের মেরে ফেলা হচ্ছে। এর সত্যাসত্য র‍্যাবই ভালো বলতে পারবে। তবে সংবাদপত্রে যে খবর বেরিয়েছে তাতে জানা যায়, খুলনার শীর্ষ সন্ত্রাসী লিটন র‍্যাবের কাছে তার পৃষ্ঠপোষক রাজনৈতিক গডফাদারও পরিচিত জামায়াত নেতা। ওই জামায়াত নেতার সঙ্গে বিরোধ ও জামায়াত ত্যাগ করে আহমদ্যার বিএনপিতে যোগদানই তার মৃত্যুর কারণ– এ ধরনের একটি ধারণা রয়েছে বিভিন্ন মহলে।

অবশ্য ক্ষমতাসীন মহল ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এসব অভিযোগকে রাজনৈতিক অভিযোগ বলে উড়িয়ে দেবেন নিঃসন্দেহে। তাদের বরং বক্তব্য যে র‍্যাবের এই 'ক্রসফায়ার' কৌশল ও সন্ত্রাস দমন অভিযান জনগণ কর্তৃক বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে। একটি জাতীয় সংবাদপত্রের তাৎক্ষণিক জনমত জরিপেও এ ধরনের তথ্য পাওয়া যায়। এদের মত হচ্ছে, এভাবে সন্ত্রাসীদের নির্মূল করা ছাড়া আর উপায়ই– বা কি আছে। কারণ তাদের গ্রেফতার করে আটক করে রাখা যায় না, জামিনে ছাড়া পেয়ে যায়। নিম্ন আদালত জামিন না দিলেও সর্বোচ্চ আদালত থেকে তারা মুক্তি পেয়ে যায়। তাদের বিরুদ্ধে ভয়ে সাক্ষ্য প্রদান না করার কারণে বিভিন্ন মামলায় চার্জশিট হওয়ার পরও তারা খালাস পেয়ে যায়। বরং ওইসব মামলার খরচ তুলতে নতুন নতুন সন্ত্রাস করে। আর এসব ক্রসফায়ারে মৃত্যুবরণকারীরা যেখানে বিভিন্ন হত্যা, অপহরণ, সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে যুক্ত বলে প্রমাণিত সুতরাং তাদের শেষ করে দেয়াই ভালো।

অনেক বিদগ্ধজন আরও একটু আগবাড়িয়ে প্রশ্ন তুলছেন, র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ারে এসব মৃত্যুর ঘটনায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের যে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, সেটাই-বা কতখানি যৌক্তিক। কারণ সন্ত্রাসীদের হাতে যে ব্যক্তি নিহত হন বা নিগৃহীত হন, যার মৃতদেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নৃশংসতার নজির স্থাপন করা হয়, তার বা তার পরিবার-পরিজনদের মানবাধিকার কি নেই? এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সাধারণ মানুষের মানবাধিকার কি প্রতিদিন লঙ্ঘিত হচ্ছে না?

এসব কথা সাধারণভাবে খুবই যৌক্তিক বলে মনে হয়। ক্ষমতাসীন কর্তৃপক্ষও সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে জনমনে ঘৃণা এবং ভীতিকেই তাদের কাজের সপক্ষে যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করছেন। কিন্তু আইন ও বিচার সম্পর্কে এ ধারণা কোনো সভ্য সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তাহলে পৃথিবীব্যাপী আইনের শাসন, মানবাধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে এত আলোচনা বিতর্ক-আন্দোলন হতো না। বরং আইনের শাসন ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে জনমনে অনাস্থাই এ ধরনের ধারণার জন্ম দেয়। বস্তুত এ দেশের পুলিশি ও বিচারব্যবস্থা এমনভাবে ভেঙে পড়েছে যে জনগণ আর তার ওপর আস্থা রাখতে পারছে না। পুলিশ যখন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না, যখন ওইসব সন্ত্রাসী তৎপরতার প্রকৃত তদন্ত হয় না এবং তাকে বিচারের সম্মুখীন করা যায় না, তখন তাৎক্ষণিক ব্যবস্থায় তার সমাধান না করাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু র‍্যাবের হাতে ক্রসফায়ারে শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মৃত্যুর ঘটনায় কেউ কেউ স্বস্তিবোধ করলেও সংবিধান, আইন, মানবাধিকার, বিচারের অধিকার– কোনো ক্রাইটেরিয়াতেই একে গ্রহণ করা যায় না। বরং এর মধ্য দিয়ে যে দানবের সৃষ্টি হচ্ছে তার অনিয়ন্ত্রিত কার্যকলাপ জনজীবনের স্থিতি ও শান্তি-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে বিপর্যয় ডেকে আনবে।

দেশের মানুষ সন্ত্রাস দমন চায়, সন্ত্রাসের হাত থেকে মুক্তি চায়; কিন্তু র‍্যাবের নামে তারা নাকের বদলে নরুণ পাচ্ছে।

রাশেদ খান মেনন: সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, সাবেক সংসদ সদস্য

৮

ভোরের কাগজ, ১২ অক্টোবর ২০০৪

'ক্রসফায়ার ইজ ক্রসফায়ার'

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

এক

আইনের শাসনের নামে অপশাসন চালালে স্বল্পমেয়াদে শাসক ও শাসকদলের লাভ হয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে যে চরম ক্ষতি হয় আইনের ভিত্তি, আইনের শাসন এবং দেশ ও জনগণের, গত কিস্তিতে সেই কথাটা লিখেছিলাম। আমি আরও লিখেছিলাম, আমরা যতোই আইন-শৃঙ্খলা, দুর্নীতি, অপশাসন আর সামাজিক রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা নিয়ে লিখি, তাতে কোনো কাজ হবে না, যেহেতু যারা শাসক এবং নীতিপ্রণেতা, যারা দেশটা চালান, তারা এসব পড়েন না, অথবা পড়লেও দ্রুত ভুলে যান, অথবা রেগে যান। এই ধারণাটা আমার বদ্ধমূল, যেমন বদ্ধমূল অন্য ধারণাটি যে নিজেদের স্বার্থে এ দেশের সরকারগুলো যেভাবে আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে ক্রমাগত একটা দুর্বল অবস্থানে ঠেলে দিচ্ছে, তাতে চূড়ান্ত একটি অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে এবং এই দেশটি দীর্ঘ দীর্ঘদিনের জন্য অনুন্নয়ন এবং নৈরাজ্যের অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

আমার দুর্ভাগ্য যে, এই দুই ধারণার পক্ষে আমি শুধু সমর্থন পাচ্ছি, প্রমাণ পাচ্ছি। আমি নিদারুণ সুখী হতাম, যদি বিপরীতটা ঘটতো। কিন্তু না, বিপরীত ঘটার কোনো লক্ষণ নেই। গত ১৪ দিনে অবনতির কয়েকটা মাত্র চিত্র তুলে ধরবো। তাতে পাঠকের হতাশা নিশ্চয় বাড়বে। কিন্তু আমার বিশ্বাস মানুষ হতাশ হতে হতে একটা সময় হয়তো সিদ্ধান্ত নেয়, আর হতাশা নয়, যথেষ্ট হয়েছে। এখন প্রতিরোধ গড়তে হবে।

প্রতিটি মানুষের ভেতর থেকে নৈতিক প্রতিরোধ যতোদিন না আসবে, ততোদিন এই অব্যবস্থা চলতে থাকবে। মন্ত্রী-আমলারা হাসতে হাসতে মিথ্যা বলতে থাকবেন, প্রধানমন্ত্রী এবং তার পরিষদগণ আমাদের জানাবেন, উন্নয়নের জোয়ারে দেশ ভেসে যাচ্ছে অথচ মানুষের নাভিশ্বাস উঠে গেছে, মানুষ চোখে অন্ধকার দেখছে। রাজনৈতিক দলগুলো যখন প্রতিরোধের ডাক দেয়, তখন তাতে নৈতিক জোরটা থাকে না। কারণ তাদের উদ্দেশ্য থাকে ক্ষমতা এবং ক্ষমতার অর্থ হচ্ছে নতুন মোড়কে পুরনো প্রথার পুনরাবৃত্তি। কিন্তু জনগণ যখন নৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তখন সরকার বদল হলেও ব্যবস্থার পরিবর্তন হয়। বডি পলিটিকে মৌলিক পরিবর্তন হয়। সরকার মানুষের চোখে ধুলো দিয়ে আয়েশ করে দিন কাটাতে পারে না। তাকে জবাবদিহি করতে হয়।

দুই

এই জবাবদিহিতার প্রসঙ্গে বলা যায়, যে ক'টি উদাহরণ এখানে উল্লেখ করবো আইনকে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠি প্রদর্শনের অর্থাৎ সরকার ও তার নানা অর্গানের পক্ষ থেকে আইনকে তোয়াক্কা না করার– তাতে ওই জবাবদিহিতার অভাবটি বড়ই প্রকট। একটা 'গণতান্ত্রিক' সরকার আমরা পেয়েছি বটে, যে জনগণের 'ভোটে' ক্ষমতায় এসেছে; কিন্তু ওই পর্যন্তই। এরপর তার আচরণ থেকে গণতান্ত্রিক ব্যাপারটি সে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলেছে। সরকারের

কর্তাব্যক্তিরা যা ইচ্ছা তাই করছেন। যোগাযোগমন্ত্রী তার নিজের স্ত্রীকে রেলওয়ের সম্পত্তি লিখে দিলেন। যোগাযোগমন্ত্রী এবং ঢাকার মেয়রের স্বার্থে আঘাত লাগায় (স্বার্থটা আবার টাকার অংকে প্রকাশ্য, এরকম ইঙ্গিত দিয়েছে পত্রিকাগুলো) ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ড থেকে কামরুল ইসলাম সিদ্দিকীকে বরখাস্ত করা হলো। নৌপরিবহনমন্ত্রীকে এক বিদেশী রাষ্ট্রদূত খোলাখুলিভাবে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করলেন বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতাসীনদের কেউ কোনো প্রশ্ন করলো না। জবাবদিহি শব্দটাই সরকারগুলো তাদের অভিধান থেকে মুছে ফেলেছে।

আর এখন যা হচ্ছে, সমগ্র বিচারব্যবস্থাকে দলীয় নিয়ন্ত্রণে আনার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চলছে। একটি কাগজে দেখলাম, আইন ও বিচার প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, বিচারব্যবস্থার পৃথকীকরণ কী, তা তিনি জানেন না। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, এটা আবার কী জিনিস? প্রতিমন্ত্রী মহোদয় দেখছি একজন ব্যারিস্টারও। তিনি যদি এটি না জানেন, তাহলে কে জানবে। সেটাই কথা। আইনমন্ত্রী যে এক ডজনেরও বেশিবার সময় বাড়ালেন এই প্রক্রিয়ার জন্য, অর্থাৎ বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের জন্য, তাও উচ্চ আদালত থেকে, তা কি আমাদের প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের জানাশোনার বাইরে হলো? আমাদের দেশে অবশ্য ফুল মন্ত্রীরা হাফ মন্ত্রীদের পাত্তাই দেন না। হাফ মন্ত্রীরা জানেনই না, মন্ত্রণালয়ে কী ঘটছে। হয়তো এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। তবে একই গোলটেবিলে যখন ফুলমন্ত্রী বলেন, চলতি বছরের মধ্যেই বিচার বিভাগ পৃথক করা সম্ভব হবে এবং হাফমন্ত্রী বলেন, এটা আবার কী জিনিস, তখন আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থার দৈন্যটাই শুধু ফুটে ওঠে।

তবে আরও মারাত্মক একটা অসঙ্গতির ঘটনা ঘটেছে এই আইন ও বিচারের ক্ষেত্রেই, যেখানে আবারো আছেন আমাদের আইনমন্ত্রী। সম্প্রতি হাইকোর্টে যে ১৯ জন অতিরিক্ত বিচারক নিয়ে সারাদেশে একটা হইচই পড়ে গেল, যার জের ধরে সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন প্রধান বিচারপতির এজলাস বয়কট করছেন, তার দায়িত্ব আইনমন্ত্রী মহোদয় প্রধান বিচারপতির ওপরই চাপিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, প্রধান বিচারপতির পাঠানো তালিকা অনুযায়ীই বিচারপতিদের নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের কয়েকজন সিনিয়র আইনজীবীর সঙ্গে এক বৈঠকে প্রধান বিচারপতি জানালেন ভিন্ন কথা। তিনি বলেন, তাঁর পাঠানো তালিকায় সরকার কাটছাঁট করেছে। একটি পত্রিকায় দেখলাম সরাসরি প্রশ্ন করা হয়েছে, 'কে মিথ্যা বলছেন?' প্রশ্নটি আমাদেরও, যদিও একটু ভিন্নভাবে তা আমরা উত্থাপন করবো। আমাদের কথা হচ্ছে, এ দু'জনের একজন নিশ্চয় ঠিক। যদি অসতর্কতার জন্য কেউ ভুলে গিয়ে থাকেন কী ঘটেছিল, তাহলে এখনি ভুল স্বীকার করে নেয়া উচিত। এটি উচ্চ আদালতের সম্মানের জন্যও জরুরি। আমাদের দেশে সকল প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়লেও এই একটা ভরসার জায়গা আমাদের এখনো আছে। এর মর্যাদা টিকিয়ে রাখা খুবই প্রয়োজন। অবশ্য কে ঠিক বলছেন না, সেটি বুঝতে আমাদের বেগ পেতে হয় না। যেভাবে আইন ও বিচার ব্যবস্থাকে দলীয়করণের প্রয়াস চলছে, তাতে তালিকাটিতে যে রদবদল হতে পারে, সেই সন্দেহ নিতান্ত অমূলক হবে না।

এই সন্দেহটি সমর্থন পায় ব্যারিস্টার রফিকুল হকের সাম্প্রতিক এক বক্তব্য থেকে। এক সময় ব্যারিস্টার হক বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। এখন নেই। তিনি বলেছেন, ১৯৯১ সালে যখন বর্তমান আইনমন্ত্রী জেলে ছিলেন, তখন তাকে 'রিলিজ করতে গিয়ে ১১ জন জজের কাছে যেতে হয়েছে। তারা বিব্রত হয়েছেন।' ব্যারিস্টার হক এরপর আইনমন্ত্রীকে বলেছেন, 'অথচ তাদেরকেই আপনি নিয়োগ দিলেন, স্থায়ী করলেন।' তিনি আরও বলেছেন, 'খারাপ জজ নিয়োগ করলে নিজেই ভিকটিম হতে হয়, আমি এটাই বুঝাতে চেয়েছি' (ভোরের কাগজ, ১৪/১০/০৪)। ব্যারিস্টার রফিকুল হক স্পষ্টবাদী মানুষ বলে প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁর কথাগুলো মনে রাখলে আইনমন্ত্রী ভালো করবেন। তবে এটি শুধু মনে রাখারাখির বা ব্যারিস্টার হকের অনুধাবনের ব্যাপার নয়। এটি মৌলিক একটি নীতির বিষয়। যিনি বিচারক হবেন, যিনি বিচারকের আসনে বসবেন, তাঁকে সকল বিতর্ক-দ্বন্দ্ব-সন্দেহের উর্ধ্বে থাকতে হবে। এই আবশ্যিকতাটা সর্বজনীনভাবে গৃহীত একটি আদর্শ। এর ব্যত্যয় ঘটলে মানুষের বিশ্বাসে চিড় ধরে এবং তা যেকোনো জাতির জন্য অমঙ্গল বয়ে আনে।

গত ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড আক্রমণ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য সরকার এক বিচারপতিকে দায়িত্ব দিল। ওই এক সদস্যবিশিষ্ট কমিশন, অর্থাৎ বিচারপতি মহোদয়, সম্প্রতি তার রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। কিন্তু যেখানে বিচারপতির মর্যাদা সমুন্নত রাখার জন্য খোদ প্রধানমন্ত্রীর কাছে তার রিপোর্ট জমা দেয়ার কথা, তিনি দিলেন স্বরাষ্ট্র সচিবের কাছে। এ বিষয়টি আমাদের অবাক করেছে। তারপর তিনি সাংবাদিকদের জানালেন, রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশের তার অধিকার নেই। কেন? যে রিপোর্ট জনগণ জানবে না, তার গ্রহণযোগ্যতা কোথায়? যদিও এই শর্তে তাকে তদন্ত কাজে নামতে হয়েছিল, তাহলে শুরুতেই তার কি উচিত ছিল না এই শর্ত পরিবর্তনের জন্য সরকারকে বলা, অন্যথায় এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া? ভারতে জনস্বার্থে বিচারপতিরা যেসব প্রশংসনীয় কাজ করেন, তার নজির কি আমরা স্থাপন করতে পারি না? বিচারপতি মহোদয় যদি জনগণের তথ্য জানার অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি সাহসী উদ্যোগ নিতেন, জনগণ তাকে অভিনন্দন জানাতো। কিন্তু তিনি তা তো করলেনই না, বরং তথ্য প্রকাশের প্রতিবন্ধকতাকে মেনে নিলেন। রিপোর্ট প্রকাশ করা না গেলেও তিনি আকারে-ইঙ্গিতে অনেক কথাই জানালেন সাংবাদিকদের। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এসব কথাবার্তা পড়ে মনে হলো, যেন সরকারের মনের কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। সবচেয়ে অবাক লাগলো তার এই মন্তব্য পড়ে যে, তিন ঘণ্টার নোটিশে আওয়ামী লীগের জনসভার তারিখ পরিবর্তন করা হয়েছে। অথচ এই জনসভার জন্য আগের দিন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছিল। এর আগে আরেক বিচারপতি বোমা হামলা ইত্যাদির জন্য শেখ হাসিনাকে সরাসরি দায়ী করেছিলেন তার তদন্ত রিপোর্টে এবং বঙ্গবন্ধুকেও তিনি অভিযুক্ত করতে ছাড়েননি। অবাক!

এসব ঘটনা আমাদের জন্য কষ্টকর। আমরা বিশ্বাস করতে চাই, শুধু আমরা, অর্থাৎ জনগণই বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা এবং আদালতগুলোর মর্যাদার জন্য লড়াই করবো না, এই প্রয়াসে শামিল হবেন আইন ও বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত সকলেই। এক্ষেত্রে উচ্চ আদালতের বিচারপতিরা আমাদের পথ দেখাতে পারেন। তারা যদি তাদের স্বাধীনতার জন্য উদ্যোগ নেন, তাতে সাফল্য দ্রুত আসবে। কিন্তু মানুষের মনে যদি এরকম ধারণা হয় যে, বিচারকরা কোনো দলের সমর্থক, তাহলে আদালতের মর্যাদার লড়াই বেশিদূর এগোবে না। আমাদের মনে আছে বছর দশেক আগে এক বিচারপতি তার বাসভবনে একটা সংবাদ সম্মেলন করেছিলেন এবং তার পাশে বসা ছিলেন তৎকালীন সরকারি ছাত্র সংগঠনের এক বিরাট নেতা। এরকম দৃশ্য আমাদের দেখতে ভালো লাগে না। এরকটা হোক, সেটা আমরা চাই না।

কাগজে দেখলাম, চট্টগ্রামে ১০ ট্রাক অস্ত্র ও গোলাবারুদ আটক মামলাটির তদন্তে কোনো অগ্রগতি হচ্ছে না। দৈনিক সংবাদ শিরোনাম দিয়েছে, 'আদালত বারবার ধমকাচ্ছে, গা করছেন না তদন্ত কর্মকর্তারা।' আরও বলা হয়েছে, "চট্টগ্রাম অস্ত্র আটক মামলায় 'উপর মহল' নাড়ছে কলকাঠি, টাকা ছড়াচ্ছে রাঘববোয়ালরা" (১৬.১০/০৪)। আদালত বারেবারে ধমকাবে, আর তদন্ত কর্মকর্তারা পরোয়া করবে না, এ কেমন কথা? এ বিষয়ে আইনে কী লেখা আছে, আমি জানি না, তবে আদালতের পরোয়া

না করাটা যে আদালত অবমাননা, এ বিষয়টা তো জানি। আদালত অবমাননা যারা করে, তাদের কী শাস্তির বিধান আছে এবং সেই শাস্তি কিভাবে দেয়া যায়, তা নিশ্চয় মাননীয় আদালত জানেন। কিন্তু কেন তা করা হচ্ছে না, এটি আমাদের অর্থাৎ আদালতের স্বাধীনতা ও মর্যাদার প্রশ্নে যারা লড়তে প্রস্তুত, তাদের জানালে কৃতার্থ হই।

গত কিস্তিতে শৈবাল সাহা পার্থ বিষয়ে লিখেছিলাম, এই ছেলেটিকে নিয়ে আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। আমাদের মনে হচ্ছে প্রকৃত অপরাধীদের বাঁচাতে পার্থকে বলির পাঁঠা বানানো হয়েছে। দেশের আইন ও বিচারের জন্য পার্থর বিষয়টাকে একটা এসিড টেস্ট হিসেবে ধরা উচিত। একজন মানুষ– সে নিরীহ হোক অপরাধী হোক সুবিচারের অধিকার রাখে। আমাদের সংবিধান তার নিশ্চয়তা দিয়েছে। অথচ পার্থকে নিয়ে চলছে লুকোচুরি। আমি গত কিস্তিতে লিখেছিলাম, পার্থ যে অপরাধী সে ব্যাপারে সুনিশ্চিত, অখণ্ডনযোগ্য সাক্ষ্য-প্রমাণ দেয়া হোক, না হয় তাকে ছেড়ে দেয়া হোক। কিন্তু কাগজে দেখলাম, ১৮ দিন হাসপাতালে রেখে অসুস্থ অবস্থাতেই পার্থকে আবার কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ছেলেটির পাশে কি মাননীয় আদালত দাঁড়াবেন? কোনো বিচারক কি নিজ উদ্যোগে তার বিষয়টি ফয়সালা করবেন? একটি মেধাবী ছেলে এভাবে কেন নিগৃহীত হবে? আর যদি সে নির্দোষ হয়, তাহলে আমাদের আইনি ও বিচারব্যবস্থার অসারতাটাই কি প্রমাণিত হবে না?

তিন

বাংলাদেশের পুলিশ সম্পর্কে অনেক অভিযোগ ওঠে; কিন্তু আমার বিশ্বাস, তাদের দক্ষতার অভাব নেই। তারা তাদের দক্ষতা দেখাতে পারে না, কারণ তারা সরকারি চাকুরে। রাজনীতিকরা তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন। শহরের ওয়ার্ড কমিশনার থেকে নিয়ে সরকারি ছাত্র সংগঠনের ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতারাও পুলিশের ওপর প্রভাব খাটান, ওপরের কথা তো বলাই বাহুল্য। এজন্য পুলিশের দক্ষতা রয়ে গেছে দক্ষতার জায়গায়, কাজে তার প্রমাণ পাওয়া মুশকিল। যেখানে রাজনৈতিক চাপ থাকে না, পুলিশ দ্রুত কাজ করতে পারে। আমি নিজে দুয়েক সময় এর প্রমাণ পেয়েছি। আমার এক বন্ধুর বাসায় চুরির এক ঘণ্টার মধ্যে বমাল চোর ধরা পড়েছে। পাড়ার এক রিক্‌শাওয়ালার চুরি যাওয়া রিকশাটি দুই ঘণ্টার মধ্যে উদ্ধার হয়েছে। এ দুটি কেস যেহেতু রাজনৈতিক নয়, পুলিশ তার দক্ষতা দেখাতে পেরেছে। কিন্তু পুলিশকে আমাদের সরকারগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা শুরু করলে তাদের দক্ষতা আড়ালে পড়ে গিয়ে বরং একটি পেটোয়া চরিত্র বেরিয়ে আসে। এখন পুলিশে নিয়োগ, পদায়ন, প্রমোশন, পোস্টিং সকল ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বিবেচনা প্রধান।

কিন্তু দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এ কারণে যে ভয়াবহ রকম বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, এটি সরকার নিজেও দেখছে, কিন্তু স্বীকার করছে না। মুখে বলছে বটে, দারুণ উন্নতি হচ্ছে। এক সময়ের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেমন বলেছিলেন, খুন বেড়েছে, কিন্তু অপরাধ কমেছে; এখনও সেরকম বলা হচ্ছে। কিন্তু মুখে বললেও সরকার যে চিন্তিত, তা বোঝা যায় নানা এলিট বাহিনীর আত্মপ্রকাশে। এরকম একটি বাহিনী হচ্ছে র‍্যাব, যার আত্মপ্রকাশের সময় নাম ছিল র‍্যাট। এর বাইরে কোবরা, চিতা ইত্যাদি নামে দু'তিন বাহিনী আছে। এগুলোর আত্মপ্রকাশ পুলিশের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। প্রতিটি দেশেই এরকম এলিট ফোর্স থাকে, কিন্তু তারা পুলিশের নিয়মিত কাজ করে না– সেসব কাজ পুলিশই করে। কাগজে দেখলাম, র‍্যাব রমজানে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য কাজ করবে। এর অর্থ হচ্ছে মজুদদারদের পাকড়াও করা, পণ্যপ্রবাহ স্থিতিশীল রাখার পেছনে সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করা ইত্যাদি। কিন্তু সেসব তো পুলিশের কাজ। সন্ত্রাসী ধরা তো পুলিশের কাজ। তাহলে পুলিশ করবেটা কী? এসব এলিট ফোর্স সন্ত্রাসী ধরছে বটে, কিন্তু এদের পদ্ধতি নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উঠেছে। র‍্যাবের নির্যাতনে অনেক মানুষ মারা যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সন্ত্রাসীদের অনেকেই 'ক্রসফায়ারে' নিহত হয়েছে। অথচ, প্রায় সকল পত্রপত্রিকার অভিমত, এই ক্রসফায়ার আসলে গুলি করে হত্যা। এরকম হত্যা আইনের চোখে অবৈধ। এক্সট্রা জুডিশিয়াল, তবুও তা ঘটছে এবং এতো বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও সরকার একে সমর্থন করে যাচ্ছে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সেদিন বললেন, 'ক্রসফায়ার ইজ ক্রসফায়ার'। এর অন্য কোনো ব্যাখ্যা তিনিগ্রহণ করবেন না। অথচ ক্রসফায়ার যে ক্রসফায়ার নয়, সেতো পত্রিকাগুলো শুরু থেকেই বলে যাচ্ছে, এই অস্বীকৃতি পুরো আইন-শৃঙ্খলা এবং বিচারব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলছে।

র‍্যাব যে সন্ত্রাসীদের ধরছে, তাতে তারা অবশ্যই অভিন্দনযোগ্য। যদিও র‍্যাবের জায়গায় পুলিশ হলে বিষয়টা যথাযথ হতো। সন্ত্রাসীরা ধরা পড়ায়, মারা যাওয়ায় এলাকার লোকজন আনন্দ মিছিল করেছে। কিন্তু সন্ত্রাসীরা মারা গেলে শুধু ওই সন্ত্রাসীরাই অপসারিত হয়, তাদের গডফাদারদের কিছু হয় না। যদি সন্ত্রাসীদের বিচারব্যবস্থায় আনা যেতো, তাদের মুখ থেকে গডফাদারদের নাম জানা যেত এবং তাদেরও গ্রেফতার করে আইনের প্রক্রিয়ায় আনা যেত, তাহলে একটা কাজের মতো কাজ হতো। জনমনে ধারণা এই যে, গডফাদারদের রক্ষা করার জন্যই সন্ত্রাসীদের মেরে ফেলা হচ্ছে, যেমন পুলিশি হেফাজতে মেরে ফেলা হয়েছিল কালা ফারুককে। গডফাদাররা ভয়ানক শক্তিশালী কিন্তু তারাই তো সন্ত্রাসের উৎস। একজন টপ সন্ত্রাসী মারা গেলে এই ১৪ কোটি জনসংখ্যার দেশে আরও ১০ টপ সন্ত্রাসী সৃষ্টি করতে এসব গডফাদারের ক'দিন লাগে?

বলা হচ্ছে, র‍্যাবের কারণে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে। এর আগে ২০০২ সালের অক্টোবরে যৌথ বাহিনীর অপারেশন ক্লিনহার্টের সময় আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি হয়েছে বলা হয়েছিল, কিন্তু আসলে কী উন্নতি হয়? হয়তো ভয় পেয়ে অনেক সন্ত্রাসী গা ঢাকা দেয়। কিন্তু ভয় দেখিয়ে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ তো সভ্য দেশের উপায় নয়। এ তো পুলিশি রাষ্ট্রের কাজ। আমাদের দেশে দীর্ঘদিন সামরিক শাসন চালু থাকায় এবং 'গণতান্ত্রিক' সরকারগুলোর স্বৈরতান্ত্রিক আচরণের জন্য এই ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে। অথচ সভ্য নাগরিক সমাজে ভয়ের স্থান নেই, আছে কনসেনসাস বা সমঝোতা এবং ব্যক্তির দায়িত্বশীলতা। আমাদের রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ; কিন্তু আইন কি মানে যানবাহন, অথবা ট্রাফিক পুলিশ নিজে? দিল্লিতে গিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। দিল্লি-ঢাকার দশগুণ বড়, রাস্তাও চল্লিশ গুণ বেশি। যানবাহনও তাই। অথচ সারা দিল্লি শহরে এত ট্রাফিক পুলিশ চোখে পড়েনি, যত থাকে আমাদের ফার্মগেটে অথবা প্রধানমন্ত্রীর অফিসের সামনে।

দিল্লির প্রসঙ্গে একটি কথা বলতে উদ্বুদ্ধ বোধ করছি। বছর পনেরো আগে প্রথম গিয়েছিলাম দিল্লি। তখন শহরটা ছিল প্রচণ্ডভাবে দূষিত। ভয়াবহ বায়ুদূষিত। এখন এটি দক্ষিণ এশিয়ার সম্ভবত সবচেয়ে কম দূষিত শহর। এর কারণ দিল্লি হাইকোর্টের কয়েকজন বিচারপতি স্বউদ্যোগে বায়ু দূষণের কারণ চিহ্নিত করে পুরনো গাড়ি নিষিদ্ধ করেছেন, যানবাহনের গ্যাসে রূপান্তরের আদেশ দিয়েছেন।

আমাদের উচ্চ আদালত অনেক কিছুই করতে পারে। আমি আশা করবো আদালত আমাদের দুর্নীতি থেকে নিয়ে নানা বিষয়ে স্বউদ্যোগে ব্যবস্থা নেবেন। আদালত এসব বিষয়ে ভূমিকা রাখতে থাকলে সরকারগুলোর বেপরোয়াত্ব প্রচুর পরিমাণে কমবে।

একটি সভ্য দেশের পরিচিতি এর আইনের শাসনে। আমরা কি একটা সভ্য দেশ হতে পারি না?

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম: অধ্যাপক ও লেখক